

তানিপা

সানজিদা সিদ্দিকী কথা





রসগোল্লা মুখে থাকা অবস্থায় মা তুলতুলিকে একটু আগে একটা চড় দিয়েছে। তুলতুলি মুখে রসগোল্লা নিয়েই হাঁ করে কাঁদছে। ওর মুখের ভেতরে থাকা চিবানো রসগোল্লা দেখে আমার কেন জানি একটু ঘণা লাগল আবার মায়াও লাগল।

আমি ওর থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আমাদের রুমের জানালার বাইরে যে লম্বা আর ঝাঁকড়ামতো কড়ইগাছটা দেখা যায়, সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

সেখানে চঞ্চল দুটো পাখি। একবার বামে তাকাচ্ছে, আরেকবার ডানে। একটু পরপর কী জানি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। যেন পাখি দুটোর মধ্যে কিছু একটা নিয়ে ঝগড়া চলছে। ঝগড়ার সময় ওরা কী বলে কে জানে। হতে পারে, একটি পাখি অন্য পাখিটির ভাগের পোকা গপ করে খেয়ে ফেলেছে, তা নিয়েই তাদের মধ্যে এই ঝগড়ার শুরু। তা ছাড়াও পাখি দুটো সম্পর্কে জামাই-বউ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

জামাই-বউয়ের ঝগড়া করাই কি নিয়ম? যদিও আমার বাবা আর মায়ের কখনো তেমন ঝগড়া হয় না। আমার বন্ধুদের বাবা-মায়ের হয়। মামা-মামির হয়। মামা অবশ্য বেশিরভাগ সময় চুপই থাকে। মামি একাই নানান কিছু বলতে থাকে। সেসব কথার বেশিরভাগই এত কুৎসিত যে, আমার মুখেই আসবে না কখনো। গত বছর বাবার চাকরি চলে যাওয়ার পরে আমরা নানুদের বাসায় চলে আসি। তখন থেকে মামির

রাগ নাকি বেশি বেড়ে গেছে। এ কথা বলেছে আমার মামাতো ভাই ফয়সাল। তাছাড়া মামা-মামির ঝগড়ার প্রধান বিষয় হচ্ছে আমরা ছয়জন মিলে অন্ন ধ্বংস করছি। আমার বাবা নাকি পুরুষ মানুষ না, এজন্যই শ্বশুরবাড়িতে এসে বউয়ের ভাইয়ের টাকায় খাচ্ছে। আমার এত খারাপ লাগে যে, বলার মতো না। তানিপা মানে আমার বড় আপা মাঝে মাঝে এ বাড়িটার বড় উঠোনের কড়ইগাছটার নিচে গিয়ে খুবই কান্না করে। আমি কাছে গেলেই বলবে, ‘তন্নয়, আমার ভালো লাগে না। আমার কিছুই ভালো লাগে না।’

আমি জবাবে কিছুই বলি না।

বাবা যখন অসহায় হয়ে মাকে বলেন, ‘তরু, আমি তোমাদের বড় লজ্জায় ফেলে দিলাম।’ তখন আমার মা বাবাকে বলেন, ‘এই বাড়িটা আমার বাবার। এখানে আমারও হক আছে। তুমি আমাদের কোনো লজ্জায় ফেলে দাওনি। আমার যেখানে হক আছে, সেখানে তোমারও হক আছে। আর আল্লাহ চিরদিন আমাদের এ অবস্থায় রাখবেন না।’

এমন কিস্ত না যে বাবা কিছুই করেন না এখন, কোথায় জানি খুব ছোটখাটো একটা চাকরি জোগাড় করেছেন। সেখানে যে বেতন পান, তা দিয়ে আলাদা একটা বাসা ভাড়া তিনি নিতে পারছেন না।

প্রতি বৃহস্পতিবারেই বাবা যতখানি পারেন বাজার করে আনেন। আমাদের জন্য কিছু আনলে সাথে করে ফয়সালের জন্যও আনেন। এরপর মাথা নিচু করে বাজারের ব্যাগটা মাকে ধরিয়ে দিয়ে গোসলে চলে যান। মা সেই বাজারের ব্যাগ রান্না ঘরে নেওয়ার সাথে সাথেই মামির ঊঁচু গলার আওয়াজ শোনা যায়। তিনি যেসব কথাবার্তা বলেন তার মধ্যে অতি সাধারণ কথা হলো—

‘পান্দাস মাছ মানুষ খায়? এই মাছ এই রান্নাঘরে ঢুকবে না। এইগুলো কী ধরনের ঢ্যাঁড়শ। বটি দিয়ে এই জিনিস কাটা সম্ভব? এক লিটার

আচ্ছা, ইট ভাঙা মানুষেরা সারাদিন ইট ভাঙে। রাতে ঘুমায়। সকালে আবার ভাঙে। ওদের কখনো ক্লান্ত লাগে না? দুঃখ লাগে না?

নিজেকে নিজে বললাম, ‘আমাদের জীবনও কি ইটের মতো? কে যেন হাতুড়ি দিয়ে ঠুকছে।’

আবার বললাম, ‘না। আমাদের জীবন তো ইট নয়। আমাদের জীবন হলো কাচ। অকারণেই ভেঙে যায়।’

আমি হাঁটছি। রাস্তায় একটা বিরিয়ানির দোকান। দোকানটা ছোট, কিন্তু তীব্র ঘ্রাণ আসছে নাকে। বিরিয়ানির ঘ্রাণটা নাকে লাগতেই গলাটা কেমন জানি করল। টের পেলাম, আমার খুব খিদে পেয়েছে। সকালে কিছু খাওয়া হয়নি। একবার আমার মনে হলো, খিদেটাই জীবনের আসল সমস্যা। আবার মনে হলো, খাওয়ার ইচ্ছাটাও কম জরুরি নয়।

বিরিয়ানির দোকানের সামনে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে খাচ্ছে। হঠাৎ করেই ভাবলাম, আপাও কি আজ বিরিয়ানি খাবে? বিয়ের পরদিন এত এত মজার খাবার আপা কি খেতে পারবে? আপার স্বশ্রববাড়িতে কি বিরিয়ানি রান্না হয়? নাকি সেখানেও শুধু আমাদের বাড়ির মতো হিসাব?

সামনে চলতে লাগলাম। এক জায়গায় একটা লুলা ফকির বসে আছে। হাঁটতে পারে না বলে তাকে সবাই লুলা বলে। ওর সামনে একটা প্লাস্টিকের বাটি। বাটিতে দুই-চারটা কয়েন। লুলা ফকির একটা কাঁপা গলায় বলছে, ‘একটা টাকা দেন, বাবা... দুইটা টাকা...’

আমি থামলাম। পকেট হাতড়ালাম। আমার কাছে কী আছে? চিটি আছে। আর কয়েন? এক টাকা আছে কি না জানি না। পকেটে একটা দুই টাকার কয়েন পেলাম। বাবার পকেটে একদিন দুই টাকা ছিল। আমার পকেটেও আজ দুই টাকা। আমি কয়েনটা বাটিতে ফেললাম। লুলা ফকির

বলল, ‘আল্লাহ তোমার বাঁচাক।’

রাস্তায় গাড়ি চলছে। বাস, লেগুনা, মোটরসাইকেল। এক-একটা গাড়ি থামলেই হকাররা দৌড়ে যায়। কারও হাতে টিস্যু, কারও হাতে পানি, কারও হাতে চার্জার। হকাররা এত জোরে দৌড়ায় যে, আমার ভয়ই লাগে। আবার গাড়ি চললে ওরা পেছনে পড়ে যায়। পড়ে গেলেও উঠে দাঁড়ায়।

আমি দেখলাম একটা ছোট ছেলে, তমালের থেকেও ছোট, হয়তো ক্লাস থ্রি-ফোর। সে দৌড়ে গিয়ে গাড়ির জনালার কাছে বলছে, ‘পানি নিবেন? পানি?’

গাড়ির ভেতর থেকে কেউ শুনছে না। ছেলেটা তবুও বলে। ছেলেটা বারবার বলে। আমার মনে হলো, এটাই ‘চেপ্টা’। মামি বলেছিল, চেপ্টা দিয়ে পেট ভরে না। কিন্তু এই ছেলেটা চেপ্টা না করলে তো পেট একদমই ভরবে না। তাহলে চেপ্টা কি পেট ভরায় না?

আমার মনে হলো, চেপ্টা দিয়ে সব হয় না। কিন্তু চেপ্টা না করলে কিছুই হয় না। আবার ভাবলাম, আমাদের বাবা তো চেপ্টা করেছেন। তবুও হলো না। কীজানি, হয়তো এখনো হয়নি। এখনো সময় আছে।

এসব ভাবতে ভাবতেই আমি স্টেশনের দিকে চলে এলাম। স্টেশনটা খুব বড় না, কিন্তু ব্যস্ত। প্ল্যাটফর্মে মানুষ বসে আছে। কেউ শুয়ে আছে। কেউ ঝুঁকে চা খাচ্ছে। চাওয়ালা চিৎকার করে বলছে, ‘চা। চা গরম, চা।’

একটা বাচ্চা ছেলে বাদাম বিক্রি করছে। তার গলায় ঝুলন্ত একটা বুড়ি। সে বলে বেড়াচ্ছে, ‘বাদাম! চানাচুররররর!’

আমি প্ল্যাটফর্মের একপাশে বসে পড়লাম। বসতেই বুকটা যেন একটু হালকা হলো। কারণ এখানে সবাই যাচ্ছে। কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করছে না—কোথায় যাচ্ছে? এখানে মানুষ শুধু যায়।

এক মঙ্গলবার রাতে তানিপা এলো বাড়িতে। হাতে ছোট একটা ব্যাগ। আর কিছু নেই। মা তানিপাকে দেখে চমকে উঠলেন। তানিপা ওড়না দিয়ে মুখের একাংশ ঢেকে রেখেছে। বাবা বিচলিত ভঙ্গিতে বললেন, ‘তানি! কী হয়েছে তানি?’

আমি এগিয়ে গেলাম। মামিও বের হয়ে এলেন—‘রাতে একা একা কীভাবে এসেছ? সরোয়ার কই? সরোয়ার আসে নাই?’

তানিপা বাঁঝালো কণ্ঠে সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘কারও কথার জবাব আমি দিতে পারব না এখন।’

এরপর আমাদের রুমে ঢুকে লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। আমি কিছু বলার আগেই আপা আমাকে বলল, ‘তন্নয়, আমার সাথে আপাতত কোনো কথা বলবি না।’

আমি কিছু বললাম না। তানিপার মতো ভদ্র একটা মেয়েকে এরকম কণ্ঠে আগে কখনোই কথা বলতে শুনিনি। কিছু একটা ভয়ংকর হয়েছে। আমার জীবনে অবশ্য গত দেড় বছর থেকে যা কিছু হয়, তার বেশিরভাগই ভয়ংকর।

রাতটা খুব অদ্ভুতভাবে থেমে ছিল। আমি বিছানার এক কোণায় বসে ছিলাম। তানিপা লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। অন্ধকারে ওর শ্বাসের শব্দও ঠিকমতো শুনতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল, তানিপা শ্বাসও নিচ্ছে খুব হিসাব করে। যেন বেশি শ্বাস নিলে কষ্ট বেড়ে যাবে।

মা বারবার দরজার কাছে এসে থমকে যাচ্ছিলেন। মা ডাকতে চাইছেন, আবার ডাকছেন না। বাবাও বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন অনেকক্ষণ। বাবার গলা একবার শুনলাম, খুব নিচু করে মাকে বলছে, ‘ওকে ঘুমাতে দাও। সকালে কথা হবে।’

মা বললেন, ‘ওর মুখটা ঢাকা ছিল, কিন্তু আমি কিছু দেখেছি মনে হয়।’

বাবা কিছু বললেন না।

রাতে অনেক দেরি করে আমি ঘুমালাম। ঘুমের মধ্যে একেকবার মনে হলো তানিপা উঠে পড়েছে। তারপর আবার মনে হলো, না।

সকালে ফজরের আজানের পর ঘুম ভাঙল। উঠেই দেখি, মা আমাদের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে পানি আর একটা ছোট থালা, ভেতরে বিস্কুট। মা দরজায় খুব আস্তে টোকা দিলেন। তানিপা কোনো সাড়া দিল না। মা আবার টোকা দিলেন। তখন তানিপা খুব শূকনো গলায় বলল, ‘ভেতরে আসো মা।’

মা ঢুকতেই আমি দেখলাম, তানিপা বিছানায় উঠে বসেছে। ওড়না ঠিক করে মুখের এক পাশ ঢেকে রেখেছে, কিন্তু ঢাকলেই তো সব ঢেকে থাকে না।

মা একদম কাছে গিয়ে বসে পড়লেন। তারপর খুব ধীরে তানিপার ওড়নার কোণটা নামিয়ে দিলেন। আমি পাশে বসে ছিলাম, আমার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। তানিপার গালের এক পাশে দাগ। চোখের নিচের অংশটা একটু ফুলে আছে। যেন কারও হাতের আঙুলের দাগ। আমার মাথা গরম হয়ে গেল। আমি কিছু বলার আগেই মা ‘হায় আল্লাহ’ বলে চিৎকার দিয়ে উঠলেন।

বাবা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বাবার চোখ একবার তানিপার মুখের দিকে পড়তেই বাবার মুখের ভঙ্গি বদলে গেল। বাবা রাগী মানুষ না। কিন্তু বাবার চোখে আমি এমন একটা রাগ দেখলাম, যেটা কথা দিয়ে বের হয় না।

বাবা শুধু জানতে চাইলেন, ‘কে করেছে?’

তানিপা কোনো জবাব দিল না। তানিপা মাথা নিচু করে বসে রইল। এরপর খুব সাধারণ গলায় বলল, ‘তোমরা কিছু জিজ্ঞেস করো না।’